৩৩
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং
[১৮৮১-১৯৫৫]

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জন্ম হয় ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত লকফিল্ড বলে এক পাহাড়ি গ্রামে। বাবা ছিলেন চাষী। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। দারিদ্র্যের মধ্যেই ছেলেবেলা কাটে ফ্লেমিংয়ের। যখন তাঁর সাত বছর বয়স, তখন বাবাকে হারান। অভাবের জন্য প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডিটুকুও শেষ করতে পারেননি।

যখন ফ্লেমিংয়ের বয়স চৌদ্দ, তাঁর ভাইরা সকলে এসে বাসা বাঁধল লণ্ডন শহরে। তাদের দেখাশুনার ভার ছিল এক বোনের উপর। কিছুদিন কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করবার পর ষোল বছর বয়স এক জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি পেলেন ফ্লেমিং। অফিসে ফাইফরমাশ খাটার কাজ।

কিছুদিন চাকরি করেই কেটে গেল। ফ্লেমিংয়ের এক চাচা ছিলেন নিঃসন্তান। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তাঁর সব সম্পত্তি পেয়ে গেলেন ফ্লেমিংয়ের ভাইরা। আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের বড় ভাই টমের পরামর্শ মত ফ্লেমিং জাহাজ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন।

অন্য সকলের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও অসাধারণ মেধায় অল্পদিনেই সকলকে পেছনে ফেলে মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হলেন ফ্লেমিং। তিনি সেন্ট মেরিজ হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে যোগ দিলেন।

১৯০৮ সালে ডাক্তারির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন কারণ সেনাবাহিনীতে খেলাধুলোর সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি।

কয়েক বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করবার পর ইউরোপ জুড়ে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সে সময় ফ্লেমিং ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর ডাক্তার হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যে গবেষণা করেছিলেন, এখানেই প্রথম তার পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলেন।

হাসপাতালে প্রতিদিন অসংখ্য সৈনিক এসে ভর্তি হচ্ছিল। তাঁদের অনেকেরই ক্ষত ব্যাকটেরিয়ার দূষিত হয়ে উঠেছিল। ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন। যে সব অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ চালু আছে তা কোনভাবেই কার্যকরী হচ্ছে না—ক্ষত বেড়েই চলেছে। যদি খুব বেশি পরিমাণে অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কিছু পরিমাণে ধ্বংস হলেও দেহকোষগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফ্লেমিং উপলব্ধি করলেন দেহের স্বাভাবিক শক্তি একমাত্র এসব ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ।

১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হল। দু মাস পর ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন ফ্লেমিং। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করবার মত কোন কিছুই খুঁজে পেলেন না।

ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে তিনি সেন্ট মেরিজ মেডিক্যাল স্কুলে ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসার হিসাবে যোগ দিলেন। এখানে পুরোপুরিভাবে ব্যাকটেরিওলজি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করলেন মানবদেহে কিছু নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে যা এই বহিরাগত জীবাণুদের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পেলেন না।

১৯২১ সাল একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করছিলেন ফ্লেমিং। কয়েকদিন ধরেই তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি তখন প্লেটে জীবাণু কালচার নিয়ে কাজ করছিলেন হঠাৎ প্রচণ্ড হাঁচি এল। নিজেকে সামলাতে পারলেন না ফ্লেমিং। প্লেটটা সরাবার আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি এসে পড়ল প্লেটের উপর। পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল দেখে প্লেটটা একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন একটা প্লেট নিয়ে কাজ শুরু করলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে গেলেন ফ্লেমিং। পরদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখা প্লেটটার দিকে নজর পড়ল। ভাবলেন প্লেটটা ধুয়ে কাজ শুরু করবেন। কিন্তু প্লেটটা তুলে ধরতেই চমকে উঠলেন। গতকাল প্লেট ভর্তি ছিল জীবাণু সেগুলো আর নেই। ভাল করে পরীক্ষা করতেই দেখলেন সব জীবাণুগুলো মারা গিয়েছে। চমকে উঠলেন ফ্লেমিং। কিসের শক্তিতে নষ্ট হল এতগুলো জীবাণু। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল খানিকটা সর্দি পড়েছিল প্লেটের উপর। তবে কি সর্দির মধ্যে এমন কোন উপাদান আছে যা এই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে পারে! পর পর কয়েকটা জীবাণু কালচার করা প্লেট টেনে নিয়ে তার উপর নাক ঝাড়লেন। দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবাণুগুলো নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। এই আবিষ্কারের উত্তেজনায় নানাভাবে পরীক্ষা শুরু করলেন ফ্লেমিং। দেখা গেল চোখের পানি, থুতুতেও জীবাণু ধ্বংস করবার

ক্ষমতা আছে। দেহনির্গত এই প্রতিষেধক উপাদানটির নাম দিলেন লাইসোজাইম। লাইস অর্থ ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা। জীবাণুকে ধ্বংস করে তাই এর নাম লাইসোজাইম।

এই লাসোজাইম সাধারণ জীবাণুগলোকে ধ্বংস করলেও অধিকতর শক্তিশালী জীবাণুগুলির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হল।

তারপর আট বছর কেটে গেল।

একদিন কিছুটা আকস্মিকভাবেই ঝড়ো বাতাসে খোলা জানলা দিয়ে ল্যাবরেটরির বাগান থেকে কিছু ঘাস পাতা উড়ে এসে পড়ল জীবাণু ভর্তি প্লেটের উপর। খানিক পরে কাজ করবার জন্য প্লেটগুলো টেনে নিতেই দেখলেন জীবাণুর কালচারের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন। মনে হল নিশ্চয়ই এই আগাছাগুলির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে এই পরিবর্তন ঘটেছে। এর আগে তিনি আগাছা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, এবার কি কারণে পরিবর্তন ঘটল। ভাল করে পরীক্ষা করতেই লক্ষ্য করলেন আগাছাগুলির উপর ছত্রাক জন্ম নিয়েছে। সেই ছত্রাকগুলি চেঁচে নিয়ে জীবাণুর উপর দিতেই জীবাণুগুলি ধ্বংস হয়ে গেল।

তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর এতদিনের সাধনা অবশেষে সিদ্ধিলাভ করল। এই ছত্রাকগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। তাই এর নাম দিলেন। পেনিসিলিন।

রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার কারণে পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেও কিভাবে তাকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ঔষধ হিসাবে প্রস্তুত করা যায় তার স্পষ্ট কোন ধারণা ফ্লেমিং করে উঠতে পারেননি।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই পেনিসিলিনের উপযোগিতা তীব্রভাবে সকলে অনুভব করল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হওয়ায় ফ্লোরির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী কিভাবে পেনিসিলিনকে ঔষধে রূপান্তরিত করা যায় তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। ফ্লোরির সাথে ছিলেন রসায়নবিদ ডঃ চেইন। কয়েক মাসের প্রচেষ্টার পর তাঁরা সামান্য পরিমাণ পেনিসিলিন তৈরি করতে সক্ষম হলেন। প্রথমে তাঁরা কিছু জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে আশাতীত ভাল ফল পেলেন। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর পরীক্ষা। আকস্মিকভাবে সুযোগ এসে গেল।

একজন পুলিশ কর্মচারী মুখে সামান্য আঘাত পেয়েছিল, তাতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তা দূষিত হয়ে রক্তের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা তার জীবনের সব আশা ত্যাগ করেছিল। ১৯৪১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রফেসর ফ্লোরি স্থির করলেন এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির উপরেই পরীক্ষা করবেন পেনিসিলিন। তাকে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর চারবার পেনিসিলিন দেওয়া হল। ২৪ ঘণ্টা পর দেখা গেল যার আরোগ্যলাভের কোন আশাই ছিল না। সে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই ঘটনায় সকলেই উপলব্ধি করতে পারল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে পেনিসিলিন।

ডাঃ চেইন বিশেষ পদ্ধতিতে পেনিসিলিনকে পাউডারে পরিণত করলেন। এবং ডাঃ ফ্লোরি তা বিভিন্ন রোগীর উপর প্রয়োগ করতেন। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার আহত মানুষের চিকিৎসায় ল্যাবরোটারিতে প্রস্তুত পেনিসিলিন প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্তই কম।

আমেরিকার Norhern Regional Research ল্যাবরেটরি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

মানব কল্যাণে নিজের এই আবিষ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন ফ্লেমিং। মানুষের কলকোলাহলের চেয়ে প্রকৃতির নিঃসঙ্গতাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত। মাঝে মাঝে প্রিয়তমা পত্নী সারিনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সারিন শুধু যে তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাই নয়, ছিলেন তাঁর যোগ্য সঙ্গিনী।

১৯৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারের তরফ থেকে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হল। ১৯৪৫ সাল তিনি আমেরিকায় গেলেন।

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে তিনি ফরাসী গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে ফ্রান্সে গেলেন। সর্বত্র তিনি বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। প্যারিসে থাকাকালীন সময়েই তিনি জানতে পারলেন এ বৎসরে মানব কল্যাণে পেনিসিলিন আবিষ্কারের এবং তার সার্থক প্রয়োগের জন্য নোবেল প্রাইজ কমিটি চিকিৎসাবিদ্যালয় ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও ডঃ চেইনকে একই সাথে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এই পুরস্কার পাওয়ার পর ফ্লেমিং কৌতুক করে বলেছিলেন, এই পুরস্কারটি ঈশ্বরের পাওয়া উচিত কারণ তিনিই সব কিছু আকস্মিক যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে তিনি আবার সেণ্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিওলজির গবেষণায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। চার বছর পর তাঁর স্ত্রী সারিন মারা যান। এই মৃত্যুতে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন ফ্লেমিং।

তাঁর জীবনের এই বেদনার্ত মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন গ্রীক তরুণী আমালিয়া তরুকা। আমালিয়া ফ্লেমিংয়ের সাথে ব্যাকটেরিওলজি নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৯৫৩ সালে দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হল না। দুই বছর পর ১৯৫৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ফ্লেমিং।